আনন্দবাজার পত্রিকা

সমবায়ের ঐতিহ্য

বাঙালি হওয়াটা অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে বইকি

অমর্ত্য সেন

৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

স্বাধীনতা: কলকাতা শহর জুড়ে সে দিন এমন অজস্র দৃশ্য রচিত হয়েছিল। ১৫ অগস্ট ১৯৪৭

দেখা যাচ্ছে যে, বাংলায় সাম্প্রদায়িক সমবায়ের এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। (‘বাঙালির স্বরূপ’, ৬-৯) খেয়াল করা দরকার, এই সহযোগিতা প্রকৃতপক্ষে সহিষ্ণুতার থেকে বৃহত্তর একটা ব্যাপার। আমার মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০) পেঙ্গুইন বুকস-এর জন্য হিন্দুধর্মের ওপরে হিন্দুইজ়ম নামে একটা বই লিখেছিলেন। বইটা খুবই সার্থকতা অর্জন করে এবং ফরাসি থেকে ফারসি পর্যন্ত নানা ভাষায় অনূদিত

হয়। (বাংলায় হিন্দুধর্ম, আনন্দ)। এ বইতে ক্ষিতিমোহন বারংবার একটি সাংস্কৃতিক দিকের কথা উল্লেখ করে যা বলতে চাইছেন তা হল, নিছক পারস্পরিক সহিষ্ণুতা নয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সুসম্পর্কের আসল ব্যাপারটা হল পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথ ভাবে কাজ করা। তাঁর সুগভীর গবেষণা প্রসূত হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা গ্রন্থে তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন, কেবল সহিষ্ণুতার চেয়ে যৌথ কাজ করাটা কত বেশি জরুরি। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ে জানতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই এই দুই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ইতিহাসটা কত দীর্ঘ।

হিন্দুদের অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে বাংলার মুসলমান রাজসভা যে বিরাট সংহতি অর্জন করেছিল, সে কথাটাও স্মরণে রাখা জরুরি। রামায়ণ ও মহাভারতের সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের কাজ শুরু হয় বাংলার মুসলমান শাসকদের নির্দেশে, মোটামুটি চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায়। মহাকাব্য দু'টির সেই অনুবাদগুলোই এখনও বাংলায় সর্বাধিক পঠিত। এক জন মুসলমান রাজার কাহিনি তো বহুলপ্রচলিত, যিনি নাকি প্রতি সন্ধ্যায় এই কাহিনিগুলি বার বার শুনতে চাইতেন। তার মানে একেবারেই এমন নয় যে, ওই মুসলমান শাসকরা তাঁদের ইসলামি ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু ধার্মিকতার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বাইরের উপাদানগুলোকেও তাঁরা যুক্ত করে গিয়েছেন। সাতশো বছর আগে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ধর্মবিশ্বাসের বাইরে মানুষের জীবনে যে অন্য অনেক দিক আছে, ধর্মীয় পরিচিতির ভারে সেগুলো ডুবে যেতে পারে না।

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বাংলায় মুসলমান শাসকদের মানসে এই ধর্মনিরপেক্ষতার বোধটি ছিল গভীর। এই ঐতিহ্য চলে এসেছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদদৌলা পর্যন্ত, ১৭৫৭-তে রবার্ট ক্লাইভ পলাশি অভিযান শুরু করে দেওয়ার পরও সিরাজের সঙ্গে সন্ধি চাওয়ার ভান করে যাচ্ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক ধূর্ততায় ক্লাইভ সিরাজকে একটা চিঠি লিখে প্রস্তাব দেন যে, তাঁদের বিরোধগুলো আপস মীমাংসা করার জন্য নবাবের বিশ্বস্ত কয়েক জনকে নিয়ে গঠিত একটা বিচারকমণ্ডলীর সামনে পেশ করা হোক। ক্লাইভের দেওয়া 'বিশ্বস্ত'দের তালিকায় ছিলেন, 'জগৎ শেঠ,

রাজা মোহনলাল, মির জাফর, রায়দুর্লভ, মির মদন', এবং নবাবের 'অন্য বড় বড় লোকেরা'। অর্থাৎ, ক্লাইভের চোখে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের 'নিজের লোক'দের তালিকায় ছিলেন চার জন হিন্দু, এক জন মুসলমান।

২

অতএব বাংলার ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতার এক দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। তা সত্ত্বেও, স্বাধীনতা-পূর্ব অবিভক্ত ভারতের রাজনীতিতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বৈর-বিভাজন চাপিয়ে দেওয়া হল, এবং তার পরিণতিতে যে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হল, সহযোগিতার দীর্ঘ ইতিহাস সেটাকে আটকাতে পারল না। ১৯৪০-এর দশকে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে, বাংলার মানুষ ভয়ানক হিংসার শিকার হল। প্রতিরোধ ছিল, এমনকি ১৯৩৭-এর প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো বিপুল ভোটে জিতল। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে প্রবল ভাবে ছড়ানো সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বিদ্বেষ সব প্রতিরোধ ভেঙে দিল। মুসলিম লিগ প্রথম নির্বাচন জিতল ১৯৪৬-এ— দেশভাগের আগে আগে। কিন্তু এর পরেই ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে— বর্তমান বাংলাদেশে— মানুষের দায়বদ্ধতা সংহত হল, ধর্মের প্রতি নয়, ভাষার প্রতি। ভাষা আন্দোলন ধর্মীয় পরিচিতি থেকে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতাকে দূরে সরিয়ে আবার বাঙালি পরিচিতি গঠনের সাধারণ দিকগুলোর দিকে সমাজের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। কিন্তু এর মাঝখানের সময়টাতে প্রাণ হারালেন লক্ষ লক্ষ মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে দেওয়া 'হিবার্ট লেকচারস'-এ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বাংলার সংস্কৃতির সমন্বয়ধর্মী চরিত্রের দিকটি আলোচনা করেছেন। এই বক্তৃতায় তিনি নিজেকে 'হিন্দু, মুসলমান, ও ব্রিটিশ— এই তিন সংস্কৃতির সঙ্গমের ফল' বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই বর্ণনা যে কোনও ধরনের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক পরিচিতিকে সরাসরি খারিজ করে, আবার অন্তর্নিহিত অর্থে তাঁর এই কথা ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে এক প্রশস্ততর মানব মর্যাদার উদ্‌যাপন করে। এই ঐতিহাসিক অনুধাবনটি বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পরে নিঃসন্দেহে বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর বেশ কিছু কবিতা অসংখ্য বাঙালি পাঠকের মনে অমর হয়ে গেঁথে আছে। নজরুলের বিশ্বজনীন মানবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থার প্রতি তাঁর সমর্থন। ১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত লাঙ্গল নামক বামপন্থী পত্রিকা নিয়মিত নজরুলের কবিতা ছাপত। এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, সেই সংখ্যাতেই অন্যান্য লেখার মধ্যে ছিল কার্ল মার্ক্সের একটি জীবনী ও ম্যাক্সিম গোর্কি-র মা উপন্যাসের তর্জমা। লাঙ্গল-এর গৃহীত যে নীতি কাগজের প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদ-নিশানে ছাপা হত, সেটা পঞ্চদশ শতকের বাঙালি কবি চণ্ডীদাসের একটি কবিতা থেকে নেওয়া:

“শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।”

এর অন্তর্নিহিত যে ধারণা, সেটাই ছিল সম্পূর্ণ ভাবে নজরুলের নিজের কথাও। কিন্তু পাঁচশো বছর আগেকার বাংলা সাহিত্যের সম্ভার থেকে কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটা যে তখনও তুলে নেওয়া গিয়েছিল, এটাও বাঙালি সংস্কৃতির একটা বিশেষত্ব।

বাঙালি চিন্তায় নজরুলের প্রভাব খুবই জোরালো। তাঁর ‘বিদ্রোহী কবি’ পরিচয় তাঁকে একটা বিশিষ্ট স্থান করে দিয়েছে, এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রেই এমনকি কট্টর রবীন্দ্রভক্তরাও রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং চা-এর মতো স্নিগ্ধ সুরভির তুলনায় নজরুলের কড়া অসম চা-এর স্বাদটা বেশি পছন্দ করেন। আমার যৌবনে প্রায় এমন কাউকে দেখিনি যে নজরুলের কাণ্ডারী হুঁশিয়ার কবিতাটা মুখস্থ বলতে পারত না। কান্ডারির প্রতি তাঁর বিশেষ হুঁশিয়ারি:

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

কিন্তু এত কিছুর পরেও এই সত্যটা থেকেই যায় যে, বাঙালি হওয়াটাই আমাদের সংগঠিত সাম্প্রদায়িক বিভেদের মোকাবিলায় একটা স্বাভাবিক রক্ষাকবচ দেবে না বা রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। এই মুহূর্তে যখন হিন্দুত্বের রাজনীতি বাংলার সামাজিক জীবনে বেশ জোরদার ভাবে ঢুকে পড়েছে, তখন এই কথাটা মনে রাখা খুব দরকার। গুরুতর বিপদ খুব দ্রুত প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িকতার চাষটা শুরু হয়েছিল বিভেদবুদ্ধির মৃদু প্রচারের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু পরের বছরগুলোয় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী হিংসা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজকে নতুন ভারতে আর এস এস এবং হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন যে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে আছে সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে নানা অছিলায় সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ (যেমন গোমাংস ভক্ষণের জন্য হত্যা করা)। এই পথে সহজেই ভয়াবহ হিংসা ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রতিবেশী অসমে নাগরিকত্বের প্রমাণ নিয়ে যে উত্তেজনা চলছে, এবং বাংলাতেও যে ভাবে লোকেদের— গো-রাজনীতির সাহায্যে বা সাহায্য ব্যতিরেকেই— ধর্মের দোহাই দিয়ে দলে টানার চেষ্টা হচ্ছে, এবং যে সাংঘাতিক ভাবে বিভেদ বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে, তা উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক হিংসার বিপদটাকে একেবারে বাস্তব করে তুলছে। আমাদের নানা ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা ও উদ্বেগ থাকতেই পারে, কিন্তু এখন পরিস্থিতিটা যে-রকম হয়ে উঠেছে তাতে সেই উদ্বেগের যুক্তিনির্ভর বিচার করা জরুরি, উদ্বেগের নিরসন করতে গিয়ে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে মেনে নিলে তার পরিণাম কী হতে পারে, সেটাও সেই বিচারের অঙ্গ হওয়া উচিত। চটকদার কিছু দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি বাংলার সংহতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

একটি সংহত ও সমবায়ী সমাজ গঠনে বাঙালি পরিচিতিটা শেষ বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু এটা এমন কোনও রক্ষাকবচ নয় যা বিভেদ ও ঘৃণাকে আটকাতে পারবেই। বাংলার সংহতির ঐতিহ্যের জোর শেষ পর্যন্ত হয়তো অতিদাহ্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রচার থেকে উদ্ভূত হিংসাকে দমন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু, সেই

সংশোধনটা হয়তো হবে অত্যন্ত ধীর গতিতে, তার আগেই বহু রক্তক্ষয় ও ঘৃণার বিষ আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। বাংলার ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান সহমর্ম এবং সুস্থ ও সংহত সমাজ গড়বার সহকর্মের যৌথ প্রয়াসের পাশাপাশি ১৯৪০-এর দশকের ভয়াবহ দাঙ্গার ইতিহাসও আছে, সেই বীভৎসতা ভাষা আন্দোলন ও অন্য ঐক্যমুখী আন্দোলনগুলোর কারণে যতই অল্পস্থায়ী হোক না কেন।

৪

হিংসার মহাত্রাসের আশঙ্কা আছে ঠিকই। কিন্তু, শত শত বছরের ইতিহাস ধরে বাহিত বাঙালি পরিচিতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে দিয়ে একটি যথাযথ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনাও আছে। বাঙালি পরিচিতি বিপর্যয়ের প্রতিষেধক না হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে একটি সুস্থ সমাজ গড়ার প্রভূত সংসাধন আছে, যদি নাকি আমরা ঘৃণা ও হিংসার দানবটাকে দমন করতে পারি। বহু যুগ ধরেই বাঙালিরা গঠনমূলক বাঙালি পরিচিতির একটি উজ্জ্বল ছবি আঁকার প্রলোভন লালন করে এসেছেন।

বক্তব্যের শেষের দিকে পৌঁছে একটা মজার, হয়তো কিছুটা লঘু, গল্প বলি। এর মধ্যে একটা হিতোপদেশও পাওয়া যেতে পারে। ঘটনাটা প্রায় একশো বছর আগের। আমি এটা শুনেছি আমার মাতামহ ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে— হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ও সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ে তাঁর গবেষণার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। গল্পটা পূজারি ও ভণ্ডামি নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত সন্দেহ বিষয়ে। এক সন্ধ্যায় সোনারং গ্রামে, ক্ষিতিমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবনীমোহন তাঁর বন্ধু মৌলভি মহফিজুদ্দিনের বাড়িতে বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। গ্রামের পুরোহিত চক্রবর্তীমশাই তখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহফিজুদ্দিন তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, ‘‘আসুন চক্রবর্তী মশাই, দুটো টান দিয়ে যান।’’ চক্রবর্তী উত্তরে জানালেন যে, ওখানে তাঁর হুঁকো খাওয়া চলবে না, তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ পুরোহিত আর মহফিজুদ্দিন মুসলমান মৌলভি। তিনি বললেন, “দেখো, আমি এক পুণ্যবান পুরোহিত, তুমি তা নও। আমরা

পরস্পরের থেকে একেবারে আলাদা।'' মৌলভি তখন তাঁকে বললেন, "ভাই হে, তোমার আর আমার মধ্যে বাস্তবিক কোনও পার্থক্য নেই। তুমি গরিব অসহায় হিন্দুদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাও, আর আমি গরিব অসহায় মুসলমানদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাই। আমাদের দু'জনের জাতব্যবসা এক্কেবারে এক।'' বাঙালি পরিচিতি দিয়ে আমরা বিপর্যয় প্রতিরোধ না-ও করে উঠতে পারি (এই কঠিন রাজনৈতিক সময়ে এটা একটা সাবধানবাণী হিসেবেই উচ্চারণ করছি), কিন্তু এই পরিচিতি আমাদের বহু আকর্ষক ধারণাকে বলবান করে তুলতে পারে— সবাই মিলে নির্দোষ আমোদ উপভোগ করাটাও যার মধ্যে একটা।

আমি অবশ্য কথা শেষ করতে চাই বাঙালি পরিচিতির সন্ধান বিষয়ে একটু গম্ভীর আলোচনার মধ্যে দিয়ে। প্রায় এক হাজার বছর আগে এক বাঙালি কবি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বাঙালি বলতে কী বোঝেন। তিনি ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ, নাম সিদ্ধাচার্য ভুসুকু। ভুসুকু পদ্মানদীর ওপর দিয়ে পুবমুখে যাত্রা করছিলেন। তাঁর একটি অত্যন্ত সুচারু চর্যাপদ-এ তিনি লিখছেন কী ভাবে তিনি বাঙালি হয়ে উঠলেন। প্রথমে নদীপথে যাত্রার সময় ডাকাতের খপ্পরে পড়ে তিনি সব হারালেন ('নিস্তার পেলেন'), এবং তার পর এক নিম্নবর্ণ চণ্ডাল রমণীকে বিয়ে করলেন, যে কাজটির মাধ্যমে জাতপাতের অসাম্যের ওপরে একটা আঘাত দেওয়া হল:

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।

অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়ি।।

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।

নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।।

(পেড়ে এনে বজ্রনাও পদ্মখালে বাওয়া

লুট করে নিল দেশ অদ্বয় বঙ্গাল

আজকে ভুসুকু হল [জাতিতে] বঙ্গালি

চণ্ডালীকে [ভুসুকুর] পত্নীরূপে নেওয়া।)

মনে হয়, ভুসুকু-র চোখে বাঙালি পরিচিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পত্তি এবং জাতপাতের বিচার থেকে নিজেকে দূরে রাখা। এ ব্যাপারে বৌদ্ধ প্রভাবটা খুবই জোরালো ছিল, তবে সে কথা তো গোড়ার দিকের বাংলায় অন্য ক্ষেত্রেও সত্য।

এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল। সেই সময়, একাদশ শতাব্দীতে বাঙালি (বঙ্গালী) বলতে বোঝা হত বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের— ঢাকা-ফরিদপুর এলাকার অধিবাসীদের— সমগ্র বাংলার লোকেদের নয়। কিন্তু এই পদটিতে স্পষ্টতই এক জন বাঙালির কী রকম জীবনযাপনের কথা বিবেচনা করা উচিত, সেই বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে। এখানে নিশ্চিত ভাবেই একটা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আছে, যে দৃষ্টি আমরাও চাইতে পারি। আমাদের সমকালের ক্ষেত্রেও এই এক হাজার বছরের পুরনো অন্বেষণের চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য থাকতে পারে। বাঙালি হওয়াটা খানিকটা অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে বইকি।

২৭ অগস্ট ২০১৯ কলকাতায় দেওয়া আইডিএসকে প্রতিষ্ঠা দিবস বক্তৃতার অনুবাদ